কৃষিতে অপর্যাপ্ত বাজেট ভবিষ্যত খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে আত্মঘাতি

১. কৃষি এখনও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিকল্পহীন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি। 'সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা' অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আগামীতে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বহাল থাকবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান প্রায় ৬০% থাকলেও বিগত বছরগুলোতে দেশে শিল্প ও সেবাসহ অন্যান্য খাতের অবদান বৃদ্ধির ফলে কৃষির অবদান আনুপাতিক হারে কমেছে। সর্বশেষ ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৬%। এর অর্থ এই নয় যে, জিডিপি'তে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে কৃষি খাতের দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান (শিল্প এবং সেবা খাতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান) অনেক বেশী। প্রান্তিক কৃষি ব্যবস্থা চর্চা করেও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে বাংলাদেশের কৃষি খাতের সাফল্য ঈর্ষনীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে মাত্র ৭০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন করলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল ৩৩৮.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

কৃষি এখনও বাংলাদেশের দরিদ্র ও ক্রমবর্ধান জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়সোর্ধ জনশক্তির প্রায় ৪৯% কৃষিতে নিয়োজিত (সূত্র: পরিসংখ্যান ব্যুরো)। কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৬৮.১% হচ্ছে নারী। সুতরাং কৃষি কেবল কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্রই নয়, নারীর অংশগ্রহন ও সামাজিক গতিশীলতারও প্রধানতম এলাকা হিসাবে এখনও বহাল আছে।

২. কৃষির উন্নয়নে নির্বাচনী অঙ্গীকার (ভিশন ২০২১)

২০০৮ সালে নির্বাচনের সময় বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম কৌশল হিসাবে কৃষি খাতের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং অঙ্গীকার করেছিলেন যে, ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, কৃষি উপখাত যেমন মৎস, হাসমুরগী, গবাদি পশু ও লবন উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহনের পর ২০০৯ সালে সরকার ভিশন-২০২১ প্রণয়ন করেন যেখানে ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল হিসাবে কৃষিতে ভর্তুকি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

৩. কিন্তু বাস্তবতায় অনেক তফাৎ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য সরকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেছে। এই বাজেটের মোট পরিমাণ হচ্ছে ২,৫০,৫০৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষির জন্য মোট বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের মাত্র ৪.৯৫%। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দারিদ্রের হার আমাদের চাইতে অনেক বেশি (প্রায় ৫০%)। সেদেশেও দারিদ্র বিমোচনের প্রধান উপায় এখন পর্যন্তকৃষি এবং জাতীয় বাজেটে কৃষির বরাদ্দ মোট বাজেটের ৭% এরও বেশি। প্রতি বছর সেখানে কৃষিতে জাতীয় চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বাজেট বরাদ্দও বাড়ানো হয়। ভারতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কৃষিতে পূর্ববর্তী বাজেটের তুলনায় ১৯.৭৩% বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদার কথা বিবেচনা করে। অথচ বাংলাদেশে আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি এবং আশঙ্কা করছি, এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের কৃষকরা ক্রমান্বয়ে কৃষি থেকে জীবন ধারনের সুযোগ হারাবে এবং একসময় ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকে পরিণত হবে।

৪. আনুপাতিক হারে কমেছে মোট বরাদ্দ

আলোচ্য বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১২,৩৯০ কোটি টাকা, যা টাকার অঙ্কে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ১১১ কোটি টাকা বেশি। কিন্তু মোট বাজেটের মধ্যে কৃষির অংশিদারিত্বের হার কমে গেছে। গত অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৫.৬৮%, অথচ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা মাত্র ৪.৯৫%। মোট বাজেটের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি বরাদ্দ বৃদ্ধিই যেখানে প্রত্যাশিত ছিল, সেখানে হয়েছে উল্টোটা। বাজেটের আকার বেড়েছে ৫.৩৪% (২,১৬,২২২ কোটি থেকে বেড়ে বাজেট হয়েছে ২,৫০,৫০৬ কোটি টাকা), অথচ বাজেটে কৃষির অংশ কমে গেছে ০.৭৩%।

গত পাঁচ বছরে এবারই কৃষি বাজেটের আকারের আনুপাতিক হারে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেল। ২০০৯-১০ বছরে কৃষির জন্য মোট বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৭.২৪%, ২০১০-১১ বছরে ছিল ৬.৫৮%, ২০১১-১২ বছরে ছিল ৬.৪০%, ২০১২-১৩ বছরে ছিল ৮.৫২%।

৫. অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ভবিষ্যতে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাধাগ্রস্থ করতে পারে

প্রতি বছর বাজেট আসলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার গাল ভরা বুলি আওড়ান আমাদের অর্থমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী। আমাদের কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলে মনে হবে তিনিই এদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন, বাকিরা সব ধোঁকা দিয়েছেন। কিন্তু বিগত বছরগুলোর অর্জনের চিত্র দেখলে প্রকৃত সত্য বের হয়ে আসে। সরকার বিগত পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন ১৮.৬৬ লাখ টন (২০১১-১২) থেকে সর্বোচ্চ ৫১.৫০ লাখ টন (২০১০-১১) পর্যন্ত বার্ষিক খাদ্যশস্য আমদানী করেছে। সর্বশেষ অর্থবছরেও সরকারকে খাদ্য আমদানী করতে হয়েছে ২৩.৪৪ লাখ টন (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, ২০১৪)। অথচ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে বলে জনগণের সাথে মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে। ২০২৫ সাল নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৮.৫৭ কোটি। এবং খাদ্য চাহিদা দাঁড়াবে ৩৭.৫ মিলিয়ন টন (সূত্র: আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১২)। অথচ আমাদের দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমছে প্রতি বছর ১% হারে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলে খাদ্য সংকট ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ৫০.৩ লাখ টনে। এই খাদ্য ঘাটতি দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন করে তুলবে এবং দারিদ্র বাড়াবে।

৬. মূল্যস্ফীতির কারণে ভর্তুকি কার্যকারিতা হ্রাস পাবে

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কৃষিতে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত অর্থ বছরেও এই একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল। বাজেটের আকার বেড়েছে, টাকার অঙ্কে বেড়েছে কৃষি বরাদ্দও। কিন্তু ভর্তুকি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এ বছর যেখানে মূল্যস্ফীতি ধরা হচ্ছে ৭%, সেখানে একই পরিমাণ বরাদ্দ রাখার মানে হল বরাদ্দকৃত ভর্তুকির কার্যকারিতা ৭% কমে গেল। সে হিসাবে, কৃষি খাতে ভর্তুকি আসলে গত অর্থবছরের তুলনায় কমেছে।

অথচ গত অর্থবছরে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সময়ই ভর্তুকির পরিমাণ বাড়ানোর দাবি উঠেছিল। কারণ, দেশের কৃষির জন্য এই বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের মতে, ঐ অর্থবছরে শুধু সারের ক্ষেত্রেই ভর্তুকির প্রয়োজন ছিল ৮,৩১৫ কোটি টাকা। সার ছাড়াও সেচ, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতির খরচ ছিল উর্ধ্বমুখী। তাছাড়া বরাদ্দকৃত ভর্তুকি কোন খাতে, কিভাবে ব্যয় করা হবে তার কোন সঠিক দিক নির্দেশনা নেই বাজেটে।

৭. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে

উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন বছরের পর বছর। আমারা দেখতে পাচ্ছি, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করে এর প্রতিবাদ করছেন (কৃষকরা তাদের উৎপাদিত আলু ক্ষেতেই ধ্বংস করছেন, দুধ রাস্তায় ঢেলে প্রতিবাদ করছেন) অথচ আমাদের কৃষি মন্ত্রীর এ বিষয়ে

কোন বক্তব্য নাই। অর্থমন্ত্রী কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার চেষ্টা হিসেবে খাদ্য মজুদের ক্ষমতা বাড়ানো ও কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি পণ্য সংগ্রহের কথা বলেছেন। কিন্তু কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, কৃষি পণ্য ক্রয় বা সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। কারণ সরকার যেভাবে পণ্য ক্রয় করে তাতে সুবিধা কৃষক পায় না, পায় মধ্যস্বত্বভোগীরা। সরকার যখন কৃষি পণ্য সংগ্রহ করে, ততদিনে সেটা কৃষকের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে এগুলোর সুফল আসলে কৃষক পাচ্ছে না। এভাবে সরকার কৃষকের বদলে মধ্যস্বত্বভোগীদের উপকার করে চলেছে।

এ বিষয়ে আমাদের দাবী হচ্ছে, কৃষক বাঁচাতে এবং কৃষি প্যণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। এই মূল্য কমিশন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাজ করবে এবং সরকারী ও বেসরকারী কৃষি পণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনবে।

৮. খোলা থাকলো আত্মঘাতি কৃষি প্রযুক্তির রাস্তা

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় জৈব প্রযুক্তি ও জেনেটিক প্রকৌশলের উদ্ভাবন ও ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। কারণ কৃষিতে জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড অরগানিজম বা জিএমও ব্যবহার নিয়ে সারা পৃথিবিতেই বিতর্ক আছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এসব ব্যবহারে ক্ষতির প্রমাণ পেয়ে গেছে। অনেক বিতর্ক আর আপত্তি সত্ত্বেও বিটি বেগুনকে এই দেশে অনুমোদন দেওয়া হয়। গাজীপুরে আমরা দেখলাম, যেসব গুণের দাবি করেছিল এই বিটি বেগুন, তার সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উৎপাদন কম হচ্ছে, পোকা আক্রমণ করছে, যা হবে না বলেই দাবি করা হয়েছিল। মূলত এ প্রযুক্তির নামে কতগুলো কোম্পানি আমাদের কৃষিকে জিম্মি করতে চায়। সরকার তারই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। প্রশ্ন আসে, ২০০৫ সালে উদ্ভাবন করলেও ভারতীয় বীজ কোম্পানি মাহিকো এখন পর্যন্ত তার নিজের দেশে বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন পায়নি কেন?

ভারতে এই বেগুনের বীজ বাজারজাতকরণের চেষ্টা চালানো হলে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারত সরকার বাধ্য হয়ে জাতীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করে। কৃষক, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদসহ বিভিন্ন জনের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার এই বেগুনের বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেয়। সে নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে এখনো। আর বাংলাদেশ সরকার তা বেশ আগ্রহের সঙ্গে উদ্বুদ্ধ করছে।

৯. 'উন্নত' বিদেশি বীজের আগ্রাসন ও সর্বস্বান্তকৃষক

বাজেটে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এই উন্নত মানের বীজ আসলে কোন বীজ? সেটা যদি হয় উন্নত মানের দেশীয় বীজ, অথবা সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদেশি বীজ তাহলে সেটা কৃষির জন্য ভাল। বিএডিসিকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। উন্নত মানের বীজ সরবরাহের নামে এ খাতটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তা হবে আত্মঘাতী। কারণ, তা শুধু বীজের মূল্যই বাড়াবে না, দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জিম্মি করে মুনাফা লুটবে।

সব ধরনের ফসল মিলে দেশি বীজের চাহিদা বছরে ১১ লাখ ৫০ হাজার টন। একটা সময় ছিল যখন দেশের মোট বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই করতো সরকার। কিন্তু ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-র চাপে বীজ সরবরাহ ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ করে সরকারের হাত দুর্বল করে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমনকি সরকারও বীজ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকার ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

বাজেটে সরকারী উদ্যোগে বীজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোন দিক নির্দশনা না থাকায় আশংকা হচ্ছে বেসরকারী মুনাফালোভী কোম্পানির দৌরাত্ম আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষক আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা মনে করি, বিএডিসিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সরকারকে নিজ উদ্যোগেই উন্নত বীজ সরবরাহ, গবেষণা ও বাজারজাতকরন নিশ্চিত করতে হবে।

১০. কৃষকের বোঝা হয়ে আছে পাট (সোনালী আঁশ)

একসময় বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৯০% আসতো পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে, বর্তমানে আসে মাত্র ২%। সরকারের ভুল নীতির কারণে বর্তমানে পাট থেকে বাংলাদেশ কোন প্রকার বাণিজ্যিক মুনাফা তৈরী করতে পারছে না। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পাটের বিশ্ব বাজার দখল করেছে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের মুনাফা তাদের ঘরেই তুলছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জিনোম আবিষ্কারের মাধ্যমে ভবিষ্যত বিশ্ববাণিজ্যে নিজেদের সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করলেও সরকার এই আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক হাতিয়ারে রূপ দেওয়ার কোন চেষ্টাই করছে না।

১১. বাজেটে কিছু ভাল সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য

বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসনের কৌশল হিসাবে আলোচ্য বাজেট যথেষ্ট নেতিবাচক, বিশেষ করে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের কৃষি বাজেটের তুলনায়। তথাপি, সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের কৃষিকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে বলে আমার মনে করি। তবে প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের কৃষির জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে যেমন:

- বর্গাচাষীদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ। উল্লেখ্য, এনজিওদের মাধ্যমে এদেশের কৃষকরা বিগত কয়েক দশক ধরে জামানত বিহীন কৃষি ঋণ পেয়ে আসছে। তবে প্রস্তাবিত জামানতবিহীন ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে।
- কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যভান্ডার তৈরি। ভারতীয় কৃষকরা ইতিমধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করেছে। আমাদের কৃষকদের জন্য এ ধরনের তথ্যভান্ডার হবে খুবই ভাল একটি মাইফলক। তবে আমাদের বাজার মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারতের চাইতে খুবই দুর্বল। এটিকে শক্তিশালী করা না গেলে শুধুমাত্র তথ্য ভান্ডার দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করা যাবে বলে আমাদের মনে হয় না।
- আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১ লাখ ৬৩ হাজার হেক্টর জমিকে বন্যামুক্ত করে ৫৪ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- পোলট্রি, গবাদি পশু খামার রক্ষায় কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিশেষ শুল্ক সুবিধা।
- হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি শুল্কমুক্ত ঘোষনা। তবে এগুলোর মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারকে অবশ্যই মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- চরাঞ্চলের জন্য ৫০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে এই বরাদ্দ চরাঞ্চলের প্রকৃত কৃষকরা কিভাবে পেতে পারে তার উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নীতিমালা থাকতে হবে। কারন চরাঞ্চলে বেশিরভাগ কৃষকের নিজের জমি নাই। বেশিরভাগ জমি খাস এবং স্থানীয় জোৎদারদের দখলে থাকায় প্রকৃত কৃষকরা আসলে নামমাত্র ভোগী।
- কৃষি ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিতকরণ

আয়োজক সংগঠনসমূহ (বর্ণক্রমানুসারে)

ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়নধারা ট্রাস্ট, এএমকেএস, কৃষক ফেডারেশন (জাই), কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষাণী সভা, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, ভিএসভি, লেবার রিসোর্স সেন্টার ও সমাজ

সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, সড়ক ২, শ্যামলী ঢাকা ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org